OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 69
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 614 - 621
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 614 - 621
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা সাহিত্যে খাদ্য রাজনীতি, শ্রেণি ও লিঙ্গ-বৈষম্য

সানাম নাসরীন
Email ID: sanam.nasrin01@gamil.com
0009-0003-1062-7368

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
Food politics, Gender inequality, patriarchy, Culinary practice, Cultural Hegemony, Domestic Space, Social Hierarchy, Bengali literature.

Abstract

This paper studies how food, social class, and gender discrimination are shown in Bengali literature. Food is not just something we eat to live. It is also a symbol of power, culture, and social position. Through the study of selected Bengali stories and novels, this paper shows how food habits and kitchen life reflect social inequality and patriarchal rules. In Bengali literature, food clearly shows the difference between rich and poor people. Rich families enjoy good and plentiful food, while poor people suffer from hunger and lack of resources. Writers use the topic of food and hunger to show the hard reality of class division and poverty in society.

Along with class differences, this paper also talks about gender discrimination related to food. In traditional families, the kitchen is the main workplace for women. Women cook for the whole family, but they often get less food or eat last because of old traditions. Also, strict rules about food for widows show how society uses food to control women's lives and freedom. At the same time, female characters in Bengali literature sometimes use cooking and food as a way to show their strength, protect their identity, and fight against family pressure. By looking at food, class, and gender together, this study shows that food is deeply connected to social justice. Everyday eating habits in literature help us understand the deep inequality present in our society.

Discussion

খাদ্য কেবল বেঁচে থাকার পথ্য নয়; এটি সমাজকাঠামোর সাথে যুক্ত অত্যন্ত জটিল বিষয়, যা সামাজিক অবস্থান ও রাজনীতির প্রতীক। সমাজকাঠামো-বৃত্ত তৈরী হওয়ার পর এর কেন্দ্রে জন্ম নিয়েছে - ক্ষমতা-সম্পর্ক, শ্রেণিগত বিন্যাস এবং লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য ইত্যাদি। এ সকল বিষয় প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হল খাদ্য। বাংলা সাহিত্যে প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগীয় আখ্যানের যুগ পার করে আধুনিক যুগের সাহিত্যে খাদ্য রাজনীতির তাৎপর্যপূর্ণ উপস্থিতি রয়েছে। এই আলোচনায় বাংলা সাহিত্যে ধারায় খাদ্য ও রন্ধন সংস্কৃতির ভেতরে লুকানো শ্রেণি বৈষম্য, নারীর অবস্থান, জাত-পাতের ভেদাভেদ এবং লিঙ্গভিত্তিক নিপীড়নের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা থেকে প্রাপ্ত বৈষম্যের রাজনীতি ও সভ্য সমাজের তথাকথিত মেকী সভ্যতার যে নগ্ন চিত্র

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 69
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 614 - 621
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

প্রকাশ পেয়েছে, তার ভিন্নদিক এই আলোচনায় বিশ্লেষিত হয়েছে। ভারত অথা বাংলার প্রধান খাদ্য ভাত, আর এই ভাতের সাথে জড়িয়ে আছে মানবসভ্যতার অস্তিত্ব। সেই অস্তিত্বের সাথে জড়িয়ে রয়েছে শ্রেণিবাদ, নারীবাদ, বৈষম্যবাদ ইত্যাদি।

ফরাসি সমাজবিজ্ঞানী পিয়ের বোরদিউ তাঁর 'ডিস্টিনকশন' তত্ত্বে বলেছিলন যে, মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও রুচি তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণি দ্বারা নির্ধারিত হয়। খাদ্যের ধরণ দ্বারা নির্ধারিত হয়-ক্ষমতাবান আর ক্ষমতাহীনের সংজ্ঞা। মঙ্গলকাব্যের আড়ম্বরপূর্ণ নৈবেদ্য থেকে শুরু করে উনিশ থেকে বিশ শতকের উপন্যাসের হেঁশেল যেন নারী জীবনের অন্ধকূপ। কিংবা খরা-মন্বন্তরের পটভূমিতে একমুঠো ভাতের জন্যে অসহায়ত্ববোধ - সর্বত্রই খাদ্য-শ্রেণি ক্ষমতার দ্যোতক হয়ে উঠেছে। 'হেঁশেল' একদিকে নারী জীবনের বন্দীদশা ও লিঙ্গবৈষম্যের প্রতীক, অন্যদিকে উচ্চশ্রেণী আয়োজিত নান্দনিক ভোজের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, শ্রেণি ও বর্ণভেদের বিভেদরেখা। সমাজের মধ্যে অবস্থানকারী এক অদৃশ্য শক্তি শ্রেণি বিন্যাসের মাধ্যমে আহারকে নির্ধারিত করে দিয়েছে। এই জন্যে মুসলিম কিংবা নীচু জাতের সাথে সমাজের অন্যনা শ্রেণি জল অবধি ভাগ করে নিতে পারে না।

হেঁশেলের রাজনীতিতে বহুক্ষেত্রে এই উদাহরণ উঠে এসেছে যে, রান্নাঘর শুধুমাত্র অন্নসংস্থানের স্থান নয়, বরং পিতৃতান্ত্রিকতা দ্বারা পরিচালিত নারীসমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রধান ঘাঁটি। 'গৃহলক্ষী', 'অন্নপূর্ণা'র মত শব্দাবলী প্রয়োগে মেকী স্তাবকতা দ্বারা নারীকে যুগব্যাপী শৃঙ্খলিত করেছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। এ প্রসঙ্গে প্রথমে আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উপন্যাসটি বাঙালী সমাজে নারী-জীবন, পারিবারিক অবস্থান ও হেঁশেলকে ঘিরে খাদ্য ও বৈষম্যের রাজনীতির অত্যন্ত বাস্তব রূপায়ণ। এ কাহিনি শুধু সত্যবতীর লড়াইয়ের গাঁথা নয়, একই সাথে এটি নারীদের বন্দীদশা, বৈধব্য জীবনের অসহ্য যন্ত্রনা, সর্বমুখী শোষিত নারী সমাজে অধিকার হরণের উদাহরণ। হেঁশেল ছিল নারীদের প্রতিপত্তি বিস্তারের একমাত্র জায়গা, নিজেদের অজান্তেই পুরুষতান্ত্রিকতার এই ফাঁদকে তারা শক্তি আস্ফালনের প্রধান ক্ষেত্র বলে মনে করে। কারণ এটি একমাত্র স্থান যেখানে পুরুষের অস্তিত্ব নেই, সমকক্ষের লড়াই হয়। ভোর থেকে রাত অবধি রান্নাঘরের হাড়ির কালি, কাঠের ধোঁয়া, আর বাসনপত্র - তথাকথিত নারী জবনের ঘরকন্নার মধ্যে কেটে যেত নারীর একটা আস্ত জীবন, নারীর বিশাল কায়িক পরিশ্রমের কোনো সামাজিক ও পারিবারিক স্বীকৃতি ছিলনা, এখনও বহুলাংশে তা নেই। এই হেঁশেল-ই নারী সমাজকে বাইরের আলো-বাতাস, মুক্ত চিন্তা ও শিক্ষা ও সুস্থ সামাজিক চেতনা থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে চিরকাল। এই জন্যে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে দেখা যায়, নারীকে এমনভাবে চালিত করা হয়েছে যে তারা প্রশ্ন করাকে পাপ বা বাড়াবাড়ি বলে মনে করে, সত্যবতীর প্রশ্নে নাজেহাল হয়ে উঠেছিল বাড়ির সকলে। মোক্ষদা কাশীশ্বরী, বিশ্বেশ্বরী- সকলের মধ্যেই ছিল অন্ধ আনুগত্য। দুঃখের বিষয় নারীর নিজের অস্তিত্ব উৎসর্গীকৃত হয়ে চলেছে, যার স্বীকৃতী সে সমাজ বা পরিবার থেকে কখনও পাবেনা – এই চেতনা নারীর নেই, পুরুষতান্ত্রিকতা এই চেতনাহীন জীবকেই চায়। অন্দরমহলের নারীদের জীবনের বড় একটি অংশ কেটে যায় হেঁশেলের ধোঁয়া ও ফুটন্ত হাঁড়ির পাশে। কুমড়ো বড়ি, খাস্তা বড়ি, পোস্ত বড়ি, তিলের বড়ির মত - বাহারি বড়ি বানাতে মোক্ষদার মত নারীদের জীবন কেটে যায় আর –

> "বড়ি দিতে দিতে মোক্ষদার হত্তেল রঙ কালসিটে মেরে যায়।" (আশাপুর্ণা দেবী, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ৫ম পরিচ্ছেদ, পৃ. ৩১)

সত্যবতীর মতো প্রতিবাদী চরিত্র যখন নিজের জন্য একটু আলো-বাতাস চায়, শিক্ষা চায় তখন সমাজ তাকে সংসারের বেড়াজালে আবদ্ধ করে দেয়, রান্নাঘরে বাঁধার চেষ্টা করে আর সেখানেই নারীর-সত্তা ও মেধা হাঁড়ির ঢাকনার কণ্ঠরোধে অস্তিত্ব হারায়।

হিন্দু পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বিধবা নারীর খাদ্যভ্যাস নিয়ন্ত্রণ ছিল লিঙ্গ বৈষম্যের অত্যন্ত কুৎসিত একটি রূপ। বিধবাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া খাদ্যাভ্যাসে, পেঁয়াজ-রসুন তো দূরের কথা, আমিষ খাদ্য তাদের জন্যে সম্পূর্ণ বর্জিত ছিল, তিল-তিসি-উচ্ছের মতো নিরামিষ খাদ্যগ্রহণের নিদান ছিল। এমনকি নির্দিষ্ট কিছু তিথিতে তাদের জলগ্রহণ করাও নিষিদ্ধ ছিল, এ কঠোরতম নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য আসলে নারী শরীরের বাসনা ও আকাঙ্খাকে দমন করা। বৈধব্য দশায় অবস্থানকারী

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 69
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 614 - 621
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নারীকে সমাজ এটি বোঝাতে চেয়েছে যে, তার এ দশার কারন সে নিজে, তাই তাকে পূর্বের খাদ্যাভ্যাস যে শুধু ত্যাগ করতে হবে তা নয়, তার থেকে বেঁচে থাকার সব অবলম্বনও কেড়ে নিতে হবে। এই জন্যে প্রথমে তাকে তার শৃঙ্গার থেকে বঞ্চিত করা হয়, তারপর খাদ্য, এরপর জাগতিক যাবতীয় ইচ্ছাকে সাদা কাপড়ের নীচে দাহ করা হত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চোখের বালি' উপন্যাসে বিনোদিনীর মত রূপসী, বুদ্ধিমতী ও প্রাণবন্ত যুবতী নারীকেও সমাজের এই কঠোর নিয়মাবলী মেনে চলতে বাধ্য করা হয়েছিল, যেখানে যত দমন হয়, সেখানে তত দ্রোহের জন্ম নেয়। বিনোদিনীর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে বিধবা নারীদের কোনো যৌবন বা কাম ইচ্ছা থাকতে পারেনা বলেই সমাজ ধরে নিয়েছিল, কিন্তু মহেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং বিহারীকে ভালোবাসার অনুভূতির সত্যতাকে সে অস্বীকার করেনি, সে তার নারীত্বকে স্বীকার করে তার আবেগকে গুরুত্ব দিয়েছিল।

খাদ্য মানুষের সামাজিক অবস্থানকে নির্দেশ করে। উচ্চবিত্তের খাবার যেখানে নান্দনিকতা ও বিলাসের প্রতীক, নিম্নবিত্তের কাছে সেখানে খাদ্য কেবল টিকে থাকার সংগ্রাম। বাংলা সাহিত্যে 'অন্ন' হল শ্রেণি-সংগ্রামের মূল পরিমাপক। উচ্চবিত্তের কাছে যা নিত্যদিন সহজলভ্য ও অতিরিক্ত, প্রান্তিক মানুষের কাছে শুধু পেট পুরে ভাত খাওয়া প্রায় অধরা স্বপ্ন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'তে অপু-দুর্গার শৈশবের প্রধান আকুতি ছিল ভালো কিছু খাওয়া - একটু মিষ্টি, একটু আমসত্ত্ব বা উপবাসের পর সামান্য ভাত। সর্বজয়ার হাঁড়িতে চাল না থাকা এবং তা আড়াল করার চেষ্টা, নিম্নবিত্তের সামাজিক আত্মমর্যাদার লড়াই ও শ্রেণি বৈষম্যের এই রূপ ফুটে উঠেছে 'পথের পাঁচালী'তে। হরিহরের ঘরে অভাব নিত্যদিনের সঙ্গী, সর্বজয়াকে প্রায় প্রতিদিন চিন্তা করতে হত, যে তার উনুনে আজ আগুন জ্বলবে কিনা। কিন্তু অন্যদিকে সেজবৌঠানের ঘরে নিত্য গরম ধোঁয়া ওঠা ভাতের কোনো অভাব ছিলনা, ভাতের সাথে থাকত নানা পদের আয়োজন, যা অপুর কাছে ছিল স্বপ্নের মত। সেজবৌঠানের ছেলে গোকুলের প্রতিদিন বাটি ভরা ঘন দুধ খেতে পেত, অন্যদিকে অপুকে চালের গুঁড়ো গুলে দুধের মত বানিয়ে সর্বজয়াকে তার পুত্রকে ভোলাতে হত।

বিভূতিভূষণ সামাজিক শোষণের প্রত্যক্ষ বিরোধ না করলেও, তিনি নিভৃতেই গ্রামীণ জীবনের অনাহার ও না পাওয়ার যে চিত্র এঁকেছেন, তা আসলে খাদ্য রাজনীতির উদাহরণ। উপন্যাসে নিশ্চিন্দিপুর গ্রামের হরিহর রায়ের পরিবার দারিদ্র্য ও শ্রেণি বৈষম্যের চরম শিকার। গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক সমাজে 'রায়' পরিবার তাদের তথাকথিত উচ্চবর্ণের ভান ধরে রাখলেও, অর্থনৈতিকভাবে তারা গ্রামীণ ক্ষমতার কাঠামোর একেবারে তলানিতে অবস্থিত। সামন্ততান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বেঁচে থাকার ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার ভাগাভগিতে নারী ও শিশুরা পেছনে পড়ে থাকে, সর্বজয়ার সংসার সামলানোর লড়াইয়ে এ অসাঙ্গস্যতা ফুটে উঠেছে।

বাধা সৃষ্টি করে। প্রতিবেশীর বাগানে পড়ে থাকা আম, চালতা ও নারকেল কুড়ানোকে যখন 'চুরি'র অপবাদ দেওয়া হয়, তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে সম্পদের ওপর অধিকার এবং খাদ্যের সহজলভ্যতা সমাজপতি ও বিত্তশাঅপু-দুর্গার শৈশবের ছোট ছোট অভিজ্ঞতায় তাদের দারিদ্রতা বোধ খুব স্পষ্ট। অপু-দুর্গার সমাজ থেকে তাদের প্রাপ্তি কিছুই নেই, এই জন্যেই তারা প্রকৃতি মায়ের দেওয়া সব রস আস্বাদন করেছে। বিত্তশালি সমাজে অবস্থানকারী মানুষের বৈশিষ্ট্য হল গরিবের দারিদ্রতার অসহায়ত্বকে না বোঝা, গরীবের ক্ষুদ্র চাওয়াকে গুরুত্ব না দেওয়া। এই জন্যে সোজোবৌঠান যখন তার পুত্র গোকুলকে মোটা সর পড়া দুধ বাটি ভরে দিত এবং অপু তা হাঁ করে দেখত, সেজবৌঠানের মাতৃহৃদয় এতটাই ক্ষুদ্র যে অপুর জন্যে একটুও ভাগ হয়নি। তাঁর হাঁ করে তাকিয়ে থাকার অর্থ যে দারিদ্রতা থেকে জন্মানো না পাওয়া বোধ, তিনি সেটিকে গুরুত্বই দেননি। এই চিত্রই সমাজে সর্বত্র। মানুষ আসলে ভোগী, ত্যাগী নয়। নিজের উদ্‌বৃত্তটুকু সর্বহারার সাথে ভাগ করে নেওয়ার মধ্যে সমাজে কিছুটা সমতা আসে, কিন্তু এই সাধুবোধ সমাজপতিদের জন্যে সমস্যা। ধনী নীলমণি রায় বা মেজোবউয়ের ঘরের প্রাচুর্য আর হরিহরের হাঁড়িতে চাল না থাকা - এই বৈষম্য অপু-দুর্গা বাল্যকালের বাল্যভাবে লীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাদের সমবয়সী খেলার সাথীরাও যখন তাদের এই আম কুড়ানোকে বিরোধ করে - এর থেকে স্পষ্ট হয় যে, বিত্তশালী শ্রেণি চরিত্র আসলে তৈরী করা করা হয়। এই স্বার্থপরতা জন্মগত নয়, বরং তা পরিবার ও সমাজ পরিচালিত।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 69
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 614 - 621
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সর্বজয়ার নিরন্তর গৃহশ্রম - অল্প চালে সবাইকে খাইয়ে নিজে অনাহারে থাকা-পিতৃতন্ত্র ও পরিবারবাদের মধ্যে নারীর অদৃশ্য শোষণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হরিহর যখন অর্থ উপার্জনের অনিশ্চিত আশায় ঘুরে বেড়ায়, তখন একা সর্বজয়াকে সংসারিক অভাব ও কন্যা হারানোর বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় –

> "হরিহর মোট পাঁচ টাকা পাঠাইয়া ছিল, তাহার পর আর পত্রও নাই, টাকাও নাই। সেও অনেকদিন হইয়া গেল। রোজ সকালে উঠিয়া সর্বজয়া ভাবে আজ ঠিক খরচ আসিবে। ছেলেকে বলে, তুই খেলে খেলে বেড়াস বলে দেখতে পাস্‌নে। ডাক-বাক্সটার কাছে বসে থাক্‌বি - পিওন যেমন আস্‌বে আর অমনি জিজ্ঞেস করবি।" (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পথের পাঁচালি', পৃ. ১২৮)

দুর্গার অকালমৃত্যু কারণ শুধু অসুখ নয়, দীর্ঘদিনের অনাহার ঘটিত পুষ্টিহীনতা, অবহেলা - তার মৃত্যুর কারণ। দুর্গার মৃত্যু আসলে একটি সামাজিক হত্যা। সর্বজয়ার স্নেহ পুত্রের প্রতি যেমনভাবে দেখা যায়, তা কন্যার প্রতি তেমনভাবে ফুটে ওঠেনা। এর ফলে ধীরে ধীরে দুর্গার শেষ পরিণতি হয় মৃত্যু। নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতির অপরূপ রূপের আড়ালে খাদ্যকে কেন্দ্র করে শ্রেণি-বঞ্চনা অত্যন্ত প্রকট ছিল। 'পথের পাঁচালী' তাই কেবল প্রকৃতির কাব্য নয়, বরং খাদ্য রাজনীতি ও সামাজিক অসাম্যের শিকার এক দরিদ্র পরিবারের টিকে থাকার সংগ্রামের কাহিনিও বটে।

খাদ্য যখন রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়, তখন সমাজে কৃত্রিম অনাহার তৈরি হয়। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'তে দেখা যায়, যারা শস্য উৎপাদনকারী সেই শস্যশ্যামলার জন্মদাতা বাংলায় কৃষকের ঘরে ধান নেই, অথচ জোতদার ও মজুতদারের গুদামে চাল পচন ধরে। গ্রামবাংলা ছেড়ে আসা হাজারো মানুষ পেটের তাগিদে কলকাতা শহরে ভিড় জমিয়েছে। শহরের চারিদিকে শুধু পেটের ক্ষুধায় মানুষের লঙ্গরখানায় ভাতের ফ্যান পাওয়ার আকুতি আর চলছে একই ডাস্টবিনে পড়ে থাকা উচ্ছিষ্ট খাবারের সাথে কুকুর ও মানুষের লড়াই। এই দৃশ্যের বর্ণনায় নাট্যকার বিজন লিখেছেন –

> "সঙ্গে সঙ্গে ডাস্টবিনের কাছে স্পটলাইটটা জ্বলে ওঠে। কুকুরটা গর্জে ওঠে যেন কাউকে কামড়ে দিলে মনে হয় আর্তনাদ শুনে। দেখা যায় কুঞ্জ তার ক্ষতবিক্ষত হাতখানা তুলে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে।" (বিজন ভট্টাচার্য, 'নবান্ন', পৃ. ৭৭)

এ চিত্র কেবল দারিদ্র্যের নয়, সমাজ শোষনের ও একচ্ছত্র ক্ষমতা কায়েমের প্রমাণও বটে। এক শ্রেণির মানুষ যখন চরম খাদ্য সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, অন্যদিক তেমন চলছে বিত্তবান শ্রেণির ভুরিভোজের দৃশ্য। যেখানে চরম আকালেও চলছে ব্যাপক অপচয় ও বিলাসের নান্দনিক সমারোহ, সেখানে কোনো অভাব নেই, অর্থাৎ এক শ্রেণি উপর উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে খাদ্য-সংকট তৈরী করা হয়েছে। এই বিপরীতমুখী দৃশ্য ব্যবহারের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজব্যবস্থার পচনশীলতাকে বিজন ভট্টাচার্য সরাসরি আক্রমণ করেছেন। এটি শুধু মন্বন্তরের নথি নয়, বরং মানবতাহীন সমাজ কাঠামোর মেকী সভ্য রূপও বটে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'ভাত' গল্পের উচ্ছব নাইয়া চরিত্রটি এই খাদ্য রাজনীতির বৈষম্যভুক্ত সমাজের নিম্নপ্রান্তে বসবাসকারী একজন ভুখা মানুষ। সে গ্রামের নিঃস্ব, সর্বহারা চরিত্র উচ্ছব, কাজের খোঁজে কলকাতায় এসে খাদ্যের অবিশ্বাস্য প্রাচুর্যকে সে প্রত্যক্ষ করে। কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত শহুরে বনেদী পরিবারের এক বুড়োকর্তার জীবন বাঁচাতে যখন বিরাট যজ্ঞের আয়োজন চলছে, সেখানে দামী নানাজাতের চালের ছড়াছড়ি - ঝিঙেকাঠি, রামশাল, বাসকাঠি, কণকচূড়, পদ্মজালি ইত্যাদি। হোমযজ্ঞের তান্ত্রিকেরা তিলকে তাল করে নানা অজুহাতে খাদ্যের অপচয় করছে। অথচ উচ্ছবের মত একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে একমুঠো ভাত দেওয়ার ক্ষেত্রে অজুহাত ও শর্ত সাপেক্ষে এই বিত্তবান পরিবারটি তার উপর কাজ বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। সমাজের এই নির্লজ্জতা ও অসংবেদনশীলতার শেষ আদেও নেই। অবশেষে বৃদ্ধটি মারা যায়, তার সুস্থতা কামনায় দীর্ঘ আয়োজিত যজ্ঞের সমস্ত খাবারকে অশুচ বলে ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তখন উচ্ছবের কয়েক যুগের জমে থাকা খিদে যেন এই অপচয়ের বিরোধিতা করে ওঠে এবং সে পিতলের হাঁড়িতে রান্না ভাত নিয়ে পলায়ন করে। উচ্ছব তখন –

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 69
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 614 - 621
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "...খাবল খাবল ভাত খায়, ভাতে হাত ঢুকিয়ে দিতে সে স্বর্গসুখ পায় ভাতের স্পর্শে। চুন্নির মা কখনো তাকে এমন সুখ দিতে পারেনি। খেতে খেতে তার যে কি হয়। মুখ ডুবিয়ে দিয়ে খায়। ভাত শুধু ভাত। বাদার ভাত। বাদার ভাত খেলে তো সে আসল বাদাটার খোঁজ পেয়ে যাবে একদিন।" (মহাশ্বেতা দেবী, 'ভাত', পৃ. ৮৫)

পরের দিন যদিও পিতলের হাঁড়ি চুরির অভিযোগে তাকে পিটিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। উচ্ছব পিতলের হাঁড়ির মধ্যে থাকা ভাতটুকুই চেয়েছিল, উচ্ছবের মত এমন বুভুক্ষ মানুষের ক্ষুধা যে সমাজ বোঝে না, কিন্তু রীতিনীতির সংস্কারে খাদ্য অপচয় যাদের কাছে স্বাভাবিক - তারা আসলেই সামাজিক কীট।

রান্নাঘর থেকে খাবারের পাত প্রতিটি স্থানই সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার যুদ্ধক্ষেত্র। খাদ্যকে কেন্দ্র করে সভ্যতার শুরু থেকেই লিঙ্গভিত্তিক শ্রম ও শোষণকে টিকিয়ে রাখা হয়েছে এবং সচেতন ভাবে শ্রেণি প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে। বিধবার পাতের নিরামিষ আহার, কৃষকের ঘরের ভাত শূণ্য হাঁড়ি কিংবা আভিজাত্যের বিলাসবহুল ভোজ - সর্বত্রই সামন্ততান্ত্রিক ও পিতৃতান্ত্রিক কাঠামোর বহিঃপ্রকাশ। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'গোরা' ও 'চোখের বালি' উপন্যাসে দৈনন্দিন খাদ্য ও রন্ধন ব্যবস্থাকে শুধু গৃহস্থালির কাজের অংশ হিসেবে দেখেননি, বরং তা দিয়ে তৎকালীন হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় চলা জাতপাত, অস্পৃশ্যতা, লিঙ্গবৈষম্য ও বৈধব্য জীবনের নিপীড়নকে ফুটিয়ে তুলেছেন। উনবিংশ ও বিশ শতকের যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন খাদ্য এবং জল গ্রহণকে কেন্দ্র করে সমাজে ছুৎমার্গ ও শ্রেণি বিন্যাসের দৃঢ় ভাবে বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ কট্টরবাদী হিন্দু গোরার কাছে খাদ্যের শুদ্ধতা এবং উচ্চবর্ণের আচার রক্ষা করাই ছিল প্রকৃত মানুষ হওয়ার সংজ্ঞা। গোরার কাছে বাস্তবতার প্রকৃত স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত হয় যখন গোরা বাংলার গ্রাম্য-জীবনে পা রাখে। চরঘোষপুরের নীলকরদের অত্যাচার, উচ্চবর্ণের সামাজিক নিষ্পেষণ এবং সাধারণ কৃষক ও মুসলমান সম্প্রদায়ের চরম দারিদ্রতা - তাকে শহুরে সভ্য ভদ্রলোকী কাল্পনিক ধারণার থেকে টেনে বাইরে নিয়ে আসে। সে বুঝতে পারে, ধর্মের নামে যে সমাজ মানুষকে অন্ন বা আশ্রয় থেকে বঞ্চিত করে, বঞ্চনার জন্যে তৈরি হওয়া শ্রেণি বৈষম্যই প্রকৃত সত্য।

জাত-পাত ও শ্রেণি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রতিবাদী চরিত্র হলেন গোরার ধাত্রীমাতা আনন্দময়ী। তাঁর রান্নাঘর সমস্ত জাত-পাত-বর্ণ-ধর্মের জন্য উন্মুক্ত ছিল, খ্রিষ্টান আয়া লছমি থেকে শুরু করে সকলের জন্য তাঁর ভালোবাসার দ্বার উন্মুক্ত ছিল। গোরা যখন তার প্রকৃত জন্মপরিচয় জানতে পারে, তখন তার কৃত্রিম ছুৎমার্গ ও সংকীর্ণতার শিকল ভেঙে যায়, খাদ্য নিয়ে বিচার ও শ্রেণি বৈষম্যের রাজনীতির এই দেয়াল ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, বৈষম্য ও ছুৎমার্গের গণ্ডি পেরিয়ে সর্বজনীন মানবতাবাদী চেতনাকে ধারণ করার মাধ্যমেই একটি প্রকৃত মুক্ত চেতনাযুক্ত সমাজের জন্ম সম্ভব।

'চোখের বালি' উপন্যাসে খাদ্য রাজনীতি ও বৈষম্যের বিষয়টি 'গোরা'র মতো প্রত্যক্ষ সামাজিক প্রতিবাদ হিসেবে আসেনি, তবে এ উপন্যাসে বিধবাদের নিরামিষ আহার, একাদশীর উপবাস এবং অন্নগ্রহণের কঠোর বিধি-বিধানের মাধ্যমে যুবতী বিধবা বিনোদিনীর শিক্ষিত বুদ্ধিমতী নারীকেও সামাজিক মিথ্যা কাঠামোর কারাগারে অধিকারহীন করে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। সেই কারাগারের মধ্যে থেকে বিনোদিনীর নিজের সত্তাকে উপলব্ধি করার চেতনা জাগরণের ঘটনা সেই সময় দাঁড়িয়ে এমন নারীর উদাহরণ বিরল। মহেন্দ্র বা বিহারীর মতো পুরুষরা যখন জীবনের সমস্ত স্বাদ ও বিলাসিতা উপভোগে ব্যস্ত, তখন বিনোদিনীকে রাঁধুনির দায়িত্বে বসিয়ে তার জীবনের সমস্ত রস উপভোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বিনোদিনীর মত সচেতন নারীও সমাজের ভণ্ডামির জালে আটকে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সে চিত্রকে খুব সুক্ষ্ম ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন –

> "বিহারীর পাতেই যে বিশেষ করিয়া মাছের মুড়া ও দধির সর পড়িল ... অসময়ে বিশেষ সন্ধানে তপসীমাছ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি ডিমওয়ালা ছিল; ... তারপর বিহারী কহিল তুমি খাইতে যাইবে না বিনোদিনী কহিল না আজ একাদশী"। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চোখের বালি', পৃ. ২৮৪)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 69
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 614 - 621
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বিধবাকে দিয়ে পঞ্চ-ব্যঞ্জন রাঁধানো যায়, কিন্তু তাকে খাওয়ার ভাগ দেওয়া যায়না, এ এক অদ্ভুত সামাজিক দ্বিচারিতা। রান্নার নৈপুণ্যতা ও কারিগরি দ্বারা নারীরা সে সময় তার বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতার আস্ফালন করলেও, বৈধব্য জীবনের অনাহার ও বঞ্চনা প্রসঙ্গে স্বয়ং নারীরা নারীদের অসহায়তাকে বুঝতে চাননি। বিনোদিনী যখন এই খাদ্যের কঠোর নিয়ম ভাঙতে চায় ও নিজের অধিকার দাবি করে, তখনই নানা ভণ্ড যুক্তি দিয়ে তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা হয়। ধর্মের দোহাই দিয়ে এবং খাদ্যের বিধিনিষেধ চাপিয়ে বিধবাদের কেবল পার্থিব সুযোগ-সুবিধা থেকেই বঞ্চিত করা হত না, বরং তাদের পূর্ণাঙ্গ মানবসত্তা ও অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হত। কিন্তু বিনোদিনী তার নিজসত্তাকে বিসর্জিত করেনি, বিহারীকে ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করে সে বৈধব্য জীবনের নিয়মের দুর্ভেদ্য প্রাচীরে ফাটল ধরিয়েছিল। কারণ সে বিধবা হওয়া সত্ত্বেও নিজের মূল্য জানত এবং সে তার ইচ্ছেকে কণ্ঠরোধ করেনি। এই জন্যে নিয়মের জটিল চক্রব্যূহের মধ্যে থাকা এক প্রদীপের নাম-বিনোদিনী। কিন্তু সেও যে সামাজিক বৈষম্যের শিকার হতে হয়নি এমন নয়, সে বিপরীতমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে সে অনন্যা।

শরৎ-সাহিত্যের প্রতিটি পর্বে রয়েছে গরিবের হাহাকার, সামাজিক ছ্যুৎমার্গ, জাত-পাত-বর্ণ বিদ্বেষ এবং নারীর আত্মত্যাগের করুণ আখ্যান। বিশেষ করে শরৎচন্দ্রের মত নারী হৃদয় ও নারী চেতনাকে খুব কম সাহিত্যিকই বুঝেছিলেন। তিনি সামাজিক অসাম্য, সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, নারী জীবনের বঞ্চনার সূক্ষ্ম হিসেব তার কাছে ছিল। এই জন্যে তার পর্যবেক্ষণ এত গভীর। 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসটি হল জমিদার শ্রেণি ও ধর্মান্ধ সমাজপতিদের হাতে নিষ্পেষিত সাধারণ দরিদ্র মানুষের অসহায়তা বোধের চরম নিষ্ঠুর রূপ। উপন্যাসটিতে বেণী ঘোষাল ও গোবিন্দ গাঙ্গুলির মতো অসভ্য সমাজপতিরা খাদ্য ও জল স্পর্শের নিয়মকে ব্যবহার করে নিম্নবর্ণের ও দরিদ্র মানুষদের নিয়ন্ত্রণে রাখার অদৃশ্য ফাঁদ তৈরী করেছিল। আড়ম্বরপূর্ণ ভোজসভা বা শ্রাদ্ধের খাবার দেওয়া-নেওয়া দিয়ে মানুষের 'জাত' ও সামাজিক অবস্থান বিচার করা হত। কেউ এই সমাজপতিদের আদেশের বাইরে গেলে তার ওপর জল-অন্ন বন্ধ করার মত কঠোর সামাজিক নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হত।

বেণী ঘোষালের মত অর্থ পিপাসু ব্যক্তিরা নিজস্বার্থে অমানবিক হতে দ্বিধা করে না। গ্রামে অতিরিক্ত বর্ষা দেখা দিলে যখন জলসেচের অভাবে চাষীদের প্রায় একশো বিঘা ফসল নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়, সেই জল বের করার একমাত্র উপায় ছিল বেণীর দিঘির সংলগ্ন বাঁধ কাটা, কিন্তু বাঁধ কাটলে যে বেণীর দুইশত টাকার মাছ সব ভেসে যাবে, কিন্তু রমেশ সে ক্ষতিপূরণের বিণিময়ে দিঘির বাঁধ কেটে দরিদ্র চাষীদের ধান বাঁচিয়ে অনাহার থেকে মুক্তি দিয়েছিল। রমেশ বেণী ঘোষালকে চাষীদের পক্ষে থেকে পরিষ্কার জানিয়েছিল –

> "...আমাদের তিন ঘরের দু-শ টাকার লোকসান বাঁচাতে গিয়ে গরীবদের সারা বছরের অন্ন মারা যাবে। যেমন করে হোক, পাঁচ-সাত হাজার টাকা তাদের ক্ষতি হবেই।" (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'পল্লীসমাজ', পৃ. ৯১)

বিশ্বম্ভরের মতো গরিব চাষীদের কৃষি নির্ভর জীবন চাষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল। তার জমির ধান না বাঁচলে সারাবছর অনাহারে কাটাতে হবে। তার আর্তনাদে ফুটে উঠেছে - শুধু খাদ্য সংস্থানের জন্য উচ্চবর্ণের কাঠগড়ায় তার মত খেটে খাওয়া মানুষদের লাঞ্ছিত হতে হয়। দরিদ্রদের বঞ্চিত করা আসলে সমাজপতিদের মানসিক ব্যধি, এই ব্যধিজাত নানা চক্রান্তই হল খাদ্য রাজনীতির নগ্নতম রূপ।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসটিতে খাদ্য রাজনীতি মূলত শহরের হোস্টেল-জীবনে ও গৃহবন্দী পরিসরে, বিশেষ করে নারীর স্থান এবং বিধবাদের ওপর সমাজ আরোপিত নিয়মাবলীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। উপন্যাসে সাবিত্রী বা কিরণময়ীর মতো চরিত্রদের মধ্যে দিয়ে আহারের কঠোরতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাবিত্রী যখন মেসে সবার জন্য অন্ন ও নানা পদের ব্যঞ্জন পরিবেশন করে, 'চোখের বালি'র বিনোদিনীর মত তার আহারের পরিধি নিরামিষ আহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। খাদ্যের এই বৈষম্য দ্বারা নারী অস্তিত্বকে সংকুচিত করার প্রবণতা হিন্দু সমাজ থেকে আজও মুছে যায়নি। মেস জীবনের যে খাদ্য বণ্টননীতি শরৎচন্দ্র এঁকেছেন, সেখানে তৎকালীন শহুরে মধ্যবিত্তের ভণ্ডামী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। যেমন সাবিত্রী, যার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 69
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 614 - 621
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অতীত বও জাত নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে, তার ছোঁয়া অন্ন গ্রহণ করা নিয়ে মেসের আবাসিকদের মধ্যে চলা তর্ক-বিতর্ক ও ভণ্ড নীতিশাস্ত্র চর্চার দিকটি চর্চিত হয়েছে। আবার অন্যদিকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন কিরণময়ীকে সমাজ শুধুমাত্র রান্নাঘরের হাঁড়ি এবং নিরামিষ আহারের বিধিনিষেধের মধ্যে বন্দি রাখতে চেয়েছিল। তার এই খাদ্যশৃঙ্খল ভাঙার চেষ্টা এবং মানসিক বিদ্রোহ উপন্যাসে খাদ্য রাজনীতির এক বড় দিক।

শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে ভাত রাজনীতির দিকটি মূলত সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, ধর্মীয় ভণ্ডামি এবং চরম শ্রেণি বৈষম্যের নির্মম রূপ হিসাবে দেখানো হয়েছে, একমুঠো ভাতের সংস্থান দ্বারা নিম্নবর্গের মানুষের জন্য বেঁচে থাকা আর মৃত্যুর সীমানা নির্ধারণ করে দেয়। গল্পের মূল চরিত্র গফুর জোলা সমাজের একেবারে প্রান্তিক শ্রেণির মানুষ। একদিকে সে মুসলমান, অন্য দিকে নিঃস্ব কৃষক। গোটা গল্পে দেখা যায়, ভাতের অভাব কেবল গফুরের শারীরিক ক্ষুধাবৃত্তি নয়, তার সমস্ত সামাজিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদা কেড়ে নিয়েছে। জমিদারি ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এমনভাবে তৈরি, যেখানে গফুরের মতো মেহনতি মানুষ দিনরাত পরিশ্রম করেও নিজের বা তার একমাত্র কন্যা আমিনার পাতে একমুঠো অন্নের সংস্থান করতে সে অক্ষম। জমিদারের খাজনা, পাওনাদারের তাগাদা এবং খরা - সবকিছু মিলে ভাতের অধিকারকে গফুর ও কন্যা আমিনার কাছ থেকে অধরা থেকে যায়। ভাতের সাথে তীব্রভাবে জড়িয়ে আছে গফুরের পোষ্য মহেশের অস্তিত্ব। যখন ঘরে চাল থাকে না, তখন ভাতের বিকল্প হয়ে যায় মাথা গোঁজার ঠাঁই হিসাবে বিচালীর খড়, খড়ের মত তুচ্ছ বিষয় নিয়েও তীব্র নিষ্ঠুরতা শুরু হয়। জমিদার তর্করত্ন ও শিববাবুর মতো উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজপতিদের ঘরে অন্নের কোনো অভাব নেই, কিন্তু তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে গফুরকে অন্নহীন ও জলহীন করে রাখে। এই নির্মম সত্যের ব্যাখ্যায় শরৎচন্দ্র বলেছেন –

> "দিনে পঁচ-ছয়বার ভাত খাওয়া যেমনি অসম্ভব তেমনি মিথ্যা। এবং পিপাসার জল না থাকার হেতুও তাহার অবিদিত নয়। গ্রামে যে দুই তিনটা পুষ্করিনী আছে তাহা একেবারে শুষ্ক। শিবচরণবাবুর খিড়কির পুকুরে যা একটু জল আছে, তাহা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে বলিয়া এই ছোট মেয়েটা ত কাছে ঘেঁষিতে পারে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দূরে দাঁড়াইয়া বহু অনুনয়বিনয়ে কেহ দয়া করিয়া যদি তাহার পাত্রে ঢালিয়া দেয় সেইটুকুই সে ঘরে আনে।" (শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'মহেশ', পৃ. ১৯৫)

অর্থাৎ দারিদ্র্যের জন্যে অনাহারে থেকে খাদ্যের জন্যে লড়াই তো বটে, সেই সাথে ধর্ম পরিচয়ের কারণে জলের জন্যে যুদ্ধ করা ছিল তাদের শ্রেণি সংগ্রামের অংশ। তাদের কারণে গফুর যখন নিজের ক্ষোভ ও ক্ষুধার যন্ত্রণায় দিশেহারা, তখন তার তীব্র দারিদ্রতা ও ক্ষুধার চূড়ান্ত শিকার হয় অবোলা পশু মহেশ।

শেষ পর্যন্ত মহেশকে হত্যা করার পর গফুর যখন ভিটেমাটি ছেড়ে চটের কলের কাজের উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়, তখন তা কেবল একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন নয়-তা হল নিজ ভূমিতে একমুঠো ভাতের অধিকার না পেয়ে একজন কৃষকের সর্বহারা শ্রমিকে রূপান্তরিত হওয়ার বেদনাদায়ক চিত্র। শরৎচন্দ্র দেখিয়েছেন, সামন্তপ্রভুরা ভাত ও জলকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে একজন সর্বহারা মানুষকে তার ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে গরিবের প্রয়োজনের অসহায়ত্বকে নিয়ে উল্লাসিত বোধ করে।

রাসুন্দরী দাসীর আত্মজীবনী 'আমার জীবন' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নারী জীবনের এক যুগান্তকারী দলিল। এটি কেবল কোনো নারীর লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনীই নয়, বরং উনিশ শতকের অন্তঃপুর, পিতৃতান্ত্রিক কুসংস্কার এবং অন্দরমহলের রান্নাঘর তথা নারী শৃঙ্খলতা ও খাদ্যের রাজনীতিকে বোঝার এক অনন্য সাহিত্যিক পাঠ। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর স্বাধিকারের কোনো মূল্য যে ছিলনা সেটি এই আত্মজীবনীটির সাথে পরিচিত হলে বোঝা সম্ভব। এই আত্মজীবনীতে দেখা যায় - একজন নারীর দায়িত্ব শুধু হেঁশেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা, ধারাবাহিক প্রজননমূলক ভূমিকার মধ্যে একজন নারীর সমস্ত ইচ্ছা চাপা পড়ে যেত। রাসসুন্দরী তিনি মোট বারোটি সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। এর মাঝেও ছিল সারাদিনের অনন্ত গৃহকর্মের বোঝা - বিশেষ করে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হাঁড়ি-পাতিল সামলানো এবং পরিবারের সবার ভোজনের ব্যবস্থা করা, নারীদের এই পরিশ্রম পরিবারের সকলের কাছে ছিল অদৃশ্য। নিজের খাদ্যাভ্যাস ও নিজের যত্ন নিয়ে ভাবার কোনো পরিসর ছিল না। পরিবারের পুরুষদের খাবার শেষে, সবার অলক্ষ্যে, দিনশেষে যেটুকু অবশিষ্টাংশ পড়ে থাকত,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 69
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 614 - 621
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

রাসসুন্দরীদেবী তা-ই গ্রহণ করতেন। এমনকি কড়া সামাজিক বিধিবিধানের কারণে দিনের পর দিন তাঁকে অনাহারে বা অর্ধেক পেটে থেকে নানা ভারী কাজ সামলাতে হত।

রাসসুন্দরী এক বিত্তশালী পরিবারের বধূ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অবস্থান মূলত একজন অবৈতনিক রাঁধুনি ও ধারাবাহিক প্রজননকারীর মতো ছিল। তাঁর পরিবারের আর্থিক প্রাচুর্য্য ছিল বটে, কিন্তু নিজের শরীরের ওপর ও নিজের সময়ের ওপর তার নিজের কোনো অধিকার ছিল না। তিনি তার আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন –

> "১৮ বৎসরে আমার প্রথম সন্তানটি হয়, আর ৪১ বৎসরে আমার সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানটি হয়। ইহার মধ্যে ঐ ২৩ বৎসর আমার যে কি প্রকার অবস্থা গত হইয়াছে তাহা পরমেশ্বর জানিতেন। ...সে সময়ে ঘরে কাজের লোক ছিলনা। ঘরের মধ্যে আমি একা মাত্র ছিলাম। আমি পূর্ব্বের ঐ নিয়ম মত সংসারের সমুদয় কাজ করিতাম। অধিকন্তু ওই কয়েকটি সন্তান পালন করিতে হয়। এই সকল কাজের গতিকে আমার দিবারাত্র বিশ্রাম ছিল না। আর অধিক কি বলিব, আমার শরীরের যত্নমাত্রও ছিল না। অন্য বিষয়ে যত্ন দূরে থাকুক, দুবেলা আহার প্রায় ঘটিত না; কাজের গতিকে কোন দিবস একবার আহারও ঘটিত না।" (রাসসুন্দরী দাসী, 'আমার জীবন', পৃ. ৩০)

এমন চরম পিতৃতান্ত্রিক শোষণের বিপরীতে রাসসুন্দরীর পাঠাভ্যাস ছিল এক বৈপ্লবিক ঘটনা। রান্নাঘরের কড়াইয়ের ছাই দিয়ে বর্ণমালা লেখার চেষ্টা, আড়ালে তালপাতার লেখা লুকিয়ে রাখা - এই সবকিছুর মাধ্যমে তিনি নারীর বন্দীদশা থেকে নিজের মানসিক মুক্তি অর্জন করেছিলেন। তিনি বন্দীদশার ভেতর থেকেই আত্মশিক্ষার মাধ্যমে নিজের কণ্ঠস্বর খুঁজে পেয়েছিলেন।

যে সমাজে খাদ্য ও সম্পদের ওপর গুটিকয়েক সামাজিক শ্রেণির নিয়ন্ত্রণ থাকে, সেখানে দরিদ্র ও বঞ্চিত শ্রেণির প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় কেবল টিকে থাকা। খাদ্যের এই রাজনীতি মানুষকে প্রতিদিনের বেঁচে থাকার লড়াইয়ে এমনভাবে ব্যস্ত রাখে যে, শিক্ষা বা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের মতো মৌলিক অধিকারগুলো তাদের নাগালের বাইরে চলে যায়। অন্ন সংস্থানের দুশ্চিন্তা মানুষের চিন্তা করার ও প্রতিবাদ জানানোর ক্ষমতাকে স্তব্ধ করে দেয়। এই কাঠামোর সবচেয়ে বড় শিকার হন নারী। পরিবার ও সামাজিক ব্যবস্থায় রান্না এবং পরিবেশনের সমস্ত অদৃশ্য শ্রম নারীর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়। দিনভর রান্নাঘরের অশেষ পরিশ্রমে নারীর চিন্তা, ব্যক্তিত্ব এবং মেধার বিকাশ ঘটানোর মতো কোনো সময় অবশিষ্ট থাকে না। তাঁর সময়কে কেবল অন্যের ক্ষুধা মেটানো এবং প্রজননমূলক দায়িত্ব পালনের খাঁচায় বন্দী থেকে যায়। সংক্ষেপে খাদ্য ও শ্রেণি সংগ্রাম কেবল পেট খালি রাখে না, তা মানুষের আত্মসম্মান, শিক্ষার অধিকার এবং নারী জীবনের সময় ও স্বাধীন সত্তাকে গ্রাস করে নেয়।

Bibliography:

চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, শরৎ-উপন্যাস সমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, রিফ্লেক্ট পাবলিশিং, ২০০৬

চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, মহেশ, শরৎ-গল্প সমগ্র, কলকাতা, বসাক বুক স্টোর প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮, পৃ. ১৯১-১৯৬

দাসী, রাসসুন্দরী, আমার জীবন, ১৮৭৬, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০২২

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চোখের বালি, ১৯০৩, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ২০১৯

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গোরা, ১৯১০, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২১

দেবী, আশাপূর্ণা, প্রথম প্রতিশ্রুতি, ১৯৬৪, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০২১

বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, পথের পাঁচালী, ১৯২৯, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৪

Warde, Alan. Consumption, Food and Taste: Cultural Practices and Social Change. SAGE Publications, 1997, pp. 88–105

ভট্টাচার্য, বিজন, নবান্ন, ১৯৯৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫

দেবী, মহাশ্বেতা, ভাত, সাহিত্যচর্চা (দ্বাদশ শ্রেনি), পশিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, ২০১৪